প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

খবরটা দিল খুদি। সহিমুদ্দিনের বড় মেয়ে। রোজকার মতো সকালবেলা চলটা-ওঠা কাপে গরম চা এনে ঘুম ভাঙাল। তারপর তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাফাতে বলল---- 'চাচা, আজ আমাদের বাছুর আনবে। আববা হাটে গেছে।'

কাল রাতে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আজ ঠাণ্ডা পড়েছে জাঁকিয়ে। কম্বল ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তার ওপর আজ ইস্কুল ছুটি। সারাদিন করারও কিছু নেই। আকাশ এখনও মেঘলা। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। জানলা দিয়ে পেছনদিকের খেত ম াঠটা দেখা যাচ্ছে দু - একজন মাঠে ফসল তোলার কাজ করছে। মনে হচ্ছে আকাশটা যেন ওদের মাথার ওপর নেমে এসেছে। এইরকম দিনগুলোতে এখনও প্রবমেম হয়...মনে হয় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে যাই। মা-দাদা-বউদি-বনশ্রী-কফিহাউস-একটা ইনফিউশন চার ভাগ করে খাওয়া---কলকাতার অলিগলি সব যেন দশ হাত বাড়িয়ে ডাকতে থাকে।

আসলে ইনটারভিউ দিয়ে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি ঠিক সেই সময় এই গ্রামের ইস্কুলের চাকরিটা হয়ে গেল ট্যালেন্টের জোরে নয় অবশ্য। মায়ের খুদকুড়ো যে দু-এক কুচি সোনা পড়েছিল মা বলল তা নাকি এতদিনে কাজে লাগল। তাতেও সবটা হল না। অগত্যা দাদার প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখন ইস্কুলের চাকরির বাজার ভাল। ঢুকলেই চারের কাছাকাছি। তাই বউদি খুব একটা ট্যা-ফোঁ করল না। তবে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই মনমরা হয়ে পড়ছিলাম। আসলে জন্ম - কর্ম কলকাতার। গ্রাম - ফ্রাম নিয়ে কোনও সেন্টিমেন্ট কখন তৈরি হয়নি। যাওয়াও হয়নি সেভাবে। কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে যে একরম গন্ডগ্রাম থাকতে পারে তা এখানে না আসলে জানতে পারতাম না। বনশ্রী বোঝাল--- ছেড়ে দিতে কতক্ষণ?' অবশ্য দুজনেই জানত াম এই কথায় বিশ্বাসের তেমন জোর নেই। তবু সেই মুহূর্তে ওই কথাটাকে আঁকড়ে থাকতে ভাল লেগেছিল।

ইন্টারভিউ-এর দিনই বোধ হয় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল আমাকে। তাই সেক্রেটারি সহিমুদ্দিনকে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে পাঠালেন। সহিমুদ্দিন ওই স্কুলের চাপরাশি। ইন্টারভিউ পর্ব মিটলে আমাকে ডেকে ইস্কুল ডেভেলপমেন্টর জন্য সামান্য পঁচিশ হাজার....? ঠিক তখনই জিজ্ঞাসা করলাম 'চারকি হলে থাকব কোথায়?' মুশকিল আসান করল সহিমুদ্দিন নিজে। হৈ হৈ করে বলে উঠল--- 'এই গঁ ায়ে তো পাকাবাড়ি, আলো, পাখা পাবেন না স্যার। আমার একটা কামরা ফাঁকা পড়ে আছে সেখানে থাকবেন। থাকার জন্য কিছু দিতে হবে না। আমার ছেলেমেয়েগুলোকে একটু লেখাপড়া দেখিয়ে দেবেন আর খাওয়া-দাওয়া বাবদ আপনার যা বিবেচনা।

এতএব সেই বিবেচনাতেই আজ বছরখানেক হয়ে এল। প্রথম মাসে একবার বাড়ি যেতাম। এখন আস্তে আস্তে কমছে। না, গ্রামকে ভ ালবেসে না। চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে লাইফটা কেমন স্ট্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করতে ইচ্ছে করে না। মধ্যবিত্ত নিরাপত্তা!

বনশ্রী আগে সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিত। এখন মাসে - দুমাসে। শেষ চিঠিতে লিখেছিল, দাদারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একমাত্র বে ানকে দূরে পাঠাবে না তাই কলকাতাতেই ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার....

সহিমুদ্দিনের ফ্যামিলির সঙ্গে মোটামুটি চলে যাচ্ছে। বাচচাগুলোও বেশ মজাদার। মুরগির ছানার মতো সারাদিন উঠোনময় ছুটে বেড়াচ্ছে। সন্ধের দিকে সবকটা যখন পুকুর পাড় থেকে 'আয় আয় চই চই' করে হাঁস তাড়িয়ে ফেরে বেশ লাগে দেখতে। বাচচাগুলে ার বোধ হয় কখনই খেয়ে পেট ভরে না। তাই, কাউকে খেতে দেখলেই সবগুলো চোখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এই এক ঝামেলা। অ ার খাওয়া - দাওয়াও তেমনি। সহিমুদ্দিনের উঠোনের শাক- পাতা, লাউ, কুমড়ো এসব দিয়ে চলে যায়। সপ্তাহে একদিন মাছ হল তো অনেক। তাও ছুটির দিন সহিমুদ্দিন সকাল থেকে ছিপ ফেলে যে কখানা কুচো - কাচা পায়। বুঝতে পারি আমার খাওয়া খরচ নিয়ে সহিমুদ্দিনের বউকে সংসারের অনেক কুটো সামাল দিতে হয়। এতদিনে অবশ্য সহিমুদ্দিনের বউয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা-টথা হয়নি। তবে বিদ্যুৎ চমকানির মতো মাঝে মাঝে আধ হাত ঘোমটার আড়াল ভেদ করে তার শরীরের কোনও কোনও অংশ দেখতেপ াই। পরিবেশনের সময়ও কনুই থেকে বাকি হাত। আর সহিমুদ্দিন বা খুদির মাধ্যমে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে চাপা গলায় ধমক - ধ ামক শুনতে পাই অবশ্য। ইস্কুল থেকে ফিরে সরষের তেল দিয়ে এক বাটি মুড়ি বরাদ্দ আমার। তাই থেকে বাচচাগুলোকেও ছিটে ফেঁ াটা দেয় না কি আর! ভাগে কম পড়ে গেলে কোনও কোনওটা হাত - পা ছড়িয়ে কাঁদে, তখন চাপা গলায় ধমক অথবা দু-একটা কিল চড়।

কদিন ধরে সহিমুদ্দিনকে খুব খুশি খুশি দেখছি। উঠোনের এক কোণে কাঠকুটো বেড়া টেড়া দিয়ে নিচেই বাছুরের থাকার জায়গা বা নিয়েছে। রোজ রাত্তিরে খাওয়া - দাওয়ার পর আবার ঘরে এসে একটু গল্পগাছা করে। সেসব নানা বিষয়। ইস্কুলের ভেতরের দল াদলি থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত অফিসের দুর্নীতি, ইলেকশনের হাওয়া, বাজার - দর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ। সেদিন আবার দুঃখ করেছিল, বাচচাদের গাছে লেপ - কাঁথা নেই। শীতে সব কষ্টপাচ্ছে। আসছে শীতে বানাতে হবে। তবে এখন কদিন সব কথার ফাঁকে ফাঁকেই বাছুর কেনার ব্যাপারটা চলে আসছিল।

সহিমুদ্দিনের সংসারেও দেখছি আজ বেশ খুশি খুশি ভাব। বাচচাগুলো ঘুরছে - ফিরছে। আজ কেউ নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে না। খিদে পেয়েছে বলে মার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছে না। বড় দুটো আবার বাছুরের কিনাম রাখা হবে তার ফিরিস্তি বানাচ্ছে। ম াঝে মাঝে আমার মতামত নিয়ে যাচ্ছে। আজ যেন ওদের মায়েরও হাঁটা চলার বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। এমনকি খোলা গলায় ছেলে- মেয়েদের ডেকেও উঠছে মাঝে মাঝে। জানিনা, আমারও ভুল হতে পারে। রোজ তো এই সময়টা থাকি না। ইস্কুল চলে যাই। তবে আজ আবার সহিমুদ্দিনের নতুন হওয়া মাসখানেকের বাচচাটা খুব জ্বালাচ্ছে । অন্যদিন যতক্ষণ থাকি সাড়াশব্দ পাই না। আজ থেকে থেকেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠছে। যত বেলা বাড়ছে আকাশও তত মুখ কালো করছে। এই দিনে চান - টান ইমপসিবল। শুধু শুয়ে আলসেমি করতে ইচ্ছে করছে। সুটকেশ খুলে জমিয়ে রাখা বনশ্রীর চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করছি। ওর লেখায় একটা দাণ মজা অ াছে। ডেইলি নিউজ পেপারের মতো। এক বছরের কাগজ স্টাডি করলে যেমন একই ধর্ষণ, একই রাজনীতি,একই খুন- জখম ঘুরে ফিরে আসে, ওর চিঠিও তেমনি। প্রতিটা চিঠিরই ভাষা, বিষয়বস্তু, স্টাইল প্রায় এক। দেখে দেখে টুকে দেয় কি-না কে জানে। মা -ও ম াঝে মাঝে পোস্টকার্ড পাঠায়। বেশিরভাগই শরীরের কথা। চোখটা দিন দিন কমজোরি হয়ে যাচ্ছে সেই আশঙ্কা। তাছাড়া, বৌদির সঙ্গে খুঁটিনাটি...।

সহিমুদ্দিনের নতুন বাচচাটা এখন আরও জোরে কাঁদছে। একই ঘরে মাঝখানে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা। সহিমুদ্দিনের বউ খুব চেষ্টা করছে ঠাণ্ডা করার। সম্ভবত বাচচাটা বুকের দুধও মুখে নিচ্ছে না। ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। বাচচাগুলো গোয়াল ঘরে আশে - প াশে খেলা করছে। একটাকে ডাকলাম। বড় ছেলেটা এল। বললাম--- 'তোদের ভাইটা আজকে এত কাঁদছে কেন রে?' ওর গায়ে সহিমুদ্দিনের একটা ছেঁড়া লুঙ্গি। গলায় কাছে গিঁট পাকানো । আজ সত্যিই জববর ঠাণ্ডা। বলল, 'জ্বর হয়েছে।' খুদি এসে বলল--- 'রান্না হয়ে গেছে। চান করতে যাও। বললাম --- আজ চান করব না। খেতে দিতে বল। রান্নাঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা। পিঁড়ি পেতে জল দিয়ে খুদি ডাকল। জিজ্ঞেস করলাম--- তোরা কখন খাবি? খুদি সারা শরীরে হাসি ছড়িএয় বলল --- আববা আসলে।

সহিমুদ্দিনের বউ খেতে দিতে এসেছে। বাচচাটা এখন আরও জোরে কাঁদছে। আজ খিচুড়ি রান্না হয়েছে। গরম গরম ধোঁয়া - ওঠা খিচুড়ি আর পেঁয়াজের বড়া। খেতে খেতে বুঝলাম, বেশ খিদে পেয়েছিল। সহিমুদ্দিনের বউ জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে আছে। আজ সহিমুদ্দিন নেই। তাই মাঝখানে খুদি। বললাম--- বাচচাটার খুব জ্বর?এই প্রথম সরাসরি। সহিমুদ্দিনের বউ ঘাড় নাড়ল। বললাম --- আমার আর কিছু লাগবে না। আপনি বাচচাটার কাছে যান।

খাওয়া - দাওয়া সেরে আবার কম্বল মুড়ি দিলাম। এখন দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি আরম্ভহয়েছে। বাচচাটারকান্না আরও বেড়েছে। চ ারপাশে ব্যাঙ ডাকছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম যখন ভাঙল তখন চারপাশ অন্ধকার। কম্বল জড়িয়েই বাইরে এলাম। একপাশে অন্ধকারের মধ্যে জড়াজড়ি করে বাচচাগুলো কলরকলর করছে। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে খুদি একটা কালি - পড়া লম্ফ এনে ঘরে রাখল। গোয়াল ঘরটা ফাঁকা। তার মানে সহিমুদ্দিন ফেরেনি। মাঝে মাঝে ছোট বাচচাটার তীব্র কান্না...।

একটু পরে খুদি আবার এল--চাচা, তেল বাড়ন্ত। তোমার লম্ফটা দেবে? বিরক্ত সুরে বললাম--- এই তো সেদিন কেরোসিন আনার জন্য পয়সা নিলি। এর মধ্যে শেষ। সন্ধেবেলা অন্ধকার ঘরে ভূতের মতো বসে থাকব? খুদিমুখ নিচু করে চলে গেল। বিছানায় খুলে র াখা জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র। পড়তে চেষ্টা করলাম। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মন বসছে না। বাইরে এখন ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝমঝম বৃষ্টি আর বাচচাটার কান্না। একটু পরে দরজার পাশে একটা ছায়া শরীর নড়ে চড়ে উঠল। অর্ধ হাত ঘোমটা। সহিমুদ্দিনের বউ। এরম কখনো আসেনি আগে। বললাম---

----কি হল?

----বাচচাটা শীতে কাঁদছে। লম্ফটা দিলে গরম সেঁক দিতাম।

সহিমুদ্দিনদের লেপ - কম্বল নেই। কিছু ছেঁড়া - ছেঁড়া কাঁথাকানি।। সেদিনই সহিমুদ্দিন বলছিল, 'আসছে শীতে...।'

সন্ধে প্রায় সাতটা বাজল। এখনও সহিমুদ্দিন ফিরছে না। বেশ ক'মাইল দূরের গ্রামে হাট। তা হলেও দুপুর দুপুর চলে আসার কথা। বাছুর কেনা নিয়ে কোন বিপদ হল কি না। এইসব হাঁচোর - পাঁচোর ভাবতে ভাবতেই...

দূর থেকে সহিমুদ্দিনের গলায় হাঁক শুনতে পেলাম। বাচচাগুলো শীত আর বর্ষাকে উপেক্ষা করেই উঠোনে নেমে পড়ল। আমি দাওয় ায় এলাম।

আপাদমস্তক ভিজে নেয়ে এসেছে সহিমুদ্দিন। সঙ্গে লালচে রঙের বাছুর। ওর গায়ের জামাটা বাছুরটার গায়ে জড়ানো। বৃষ্টি আর

শীত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। সহিমুদ্দিনের বউও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চাগুলো কোলাহল করছে। বাছুরটার গায়ে - মাথায় হাত বুলোচ্ছে। সহিমুদ্দিন আমার দিকে তাকাল--- 'পার্বতীপুরের দিকে এক হাঁটু জল জমে গেছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে আজ!' আমি একটু হাসলাম। বললাম ---'তাড়াতাড়ি গা- মাথা মোছ। জ্বর - টর হয়ে যাবে।' সহিমুদ্দিন গা কাঁপিয়ে হাসল--- 'আমাদের ওসব অভ্যাস আছে।' ঘর থেকে লম্ফটা বাইরে এনেছে সহিমুদ্দিনের বউ। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।

লম্ফের কাঁপা - কাঁপা আলোয় গোয়ালঘরে সহিমুদ্দিনের ছায়াটা নড়াচড়া করতে দেখলাম। বাছুরটা কাঁদছে। ঠাণ্ডায়, না মাকে না পেয়ে কে জানে। সহিমুদ্দিনের বাচ্চাটাও কাঁদছে পাল্লা দিয়ে। ঘরে চলে এলাম। বাছুরের থাকার ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক করে জামাকাপড় ছেড়ে সহিমুদ্দিন ঠিক আসবে একবার। একটা সিগারেট ধরালাম। এই ঠাণ্ডায় শরীরটা গরম থাকে। সহিমুদ্দিনও এল। বললাম--- 'এসো, বলো।' ও ঘরে ঢুকল। বসল না। কি একটু ভাবল। তারপর এক ঝোঁকে বলে ফেলল--- 'আপনার তো আরও একটা চাদর আছে। কম্বলটা দিন না!' খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আগুন-জ্বর গায়ে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছে না। সকাল থেকে কাঁদছে। কিন্তু এ কথাটা মাথায় আসেনি। সারাদিন বউ নিজে বলতে পারেনি বলে এখন সহিমুদ্দিনকে দিয়ে বলাচ্ছে? মনে কোথায় একটু খচখচ করতে লাগল। লজ্জাবোধ! কি জানি? গা থেকে কম্বলটা খুলে দিলাম। বালিশের তলা থেকে গরম চাদরটা বার করে জড়িয়ে নিলাম। অন্ধকার ঘরে ঝুম হয়ে বসে আছি। উঠোনের দিক থেকে এখনও আলোর আভাস আসছে। সহিমুদ্দিন গোয়ালঘরে কি করছে? বাছুরটা এখনও কাঁদছে অবশ্য। বাইরে বেরলাম। সহিমুদ্দিনের কাণ্ড দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমার কম্বলটা দিয়ে বাছুরটা আগাপাশতলা জড়িয়ে লম্ফ নিয়ে সহিমুদ্দিন বারান্দায় উঠে আসছে।

আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল। অসহ্য! রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছে। ঘর থেকে এখনও বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ আসছে। বললাম--- 'এর মানে?' আমার ধমকে সহিমুদ্দিন অপ্রস্তুত হল না। একটু চুপ করে থেকে যেন ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধ তৈরি করে নিল। বলল---'বাছুরটা ঠাণ্ডায় মরে যাবে স্যার।' ওর নৃশংসতা দেখে আমি ক্ষেপে উঠলাম। হিংস্র কণ্ঠে বললাম--- 'আর বাচ্চাটা?' মাথা নিচু করে ফেলল সহিমুদ্দিন। বলল ---'তিরিশ বছর ধরে আজকের দিনটার স্বপ্ন দেখছি স্যার। কত কষ্টে তিলে তিলে পয়সাকটা জমিয়েছি।' হাতের লম্ফটা এবার এপরে তল। আমার দিকে সোজাসুজি তাকাল। খুব পরিষ্কার করে বলল--- 'একটা বাচ্চা গেলে আরও একটা বাচ্চা পয়দা করতে পারব। বাছুরটা গেলে জিন্দেগীতে আর বাছুর কিনতে পারব স্যার?'

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লম্ফের কাঁপা - কাঁপা আলোয় সহিমুদ্দিনের মুখ দেখলাম। আশ্চর্য, এই আবছা আলো - আঁধারিতে সহিমুদ্দিনের মুখটা ঠিক ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো লাগছে! ওইরকম তিন কোণা। তবে কি, সহিমুদ্দিনের গলায় ভারতবর্ষ কথা বলে উঠল? না-কি ভারতবর্ষের গলায় সহিমুদ্দিন?

আজ কাল পরশুর গল্প থেকে সংগৃহীত